ফরাসি বিপ্লব

ইউনিট
২

ভূমিকা

ফরাসি বিপ্লব আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তার জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। চতুর্দশ লুইয়ের শাসনামলে (১৬৫১-১৭১৫ খ্রি.) ফ্রান্স একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে তার সাম্রাজ্যবাদী নীতি দেশকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। তার পুত্র পঞ্চদশ লুই (১৭১৫-১৭৭৪ খি.) এর অমিতব্যায়িতা জন্য এই দুর্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়। ষোড়শ লুই ১৭৭৪ সালে সিংহাসনে বসে ক্রমশ এক অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন। আর্থ সামাজিক বৈষম্য রাজনৈতিক দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৭৮৯ সলে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ঐতিহাসিক আলফ্রেড কোবান (Alfred Cobban) এই অবস্থাবে অনেক ছোট বড় খরস্রোতা নদীর সংমিশ্রণে হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা বিধ্বংসী বন্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল কারাদুর্গ আক্রমণ ও এর পতনের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় বিশ্ব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় যা বিখ্যাত হয়েছে ফরাসি বিপ্লব নামে।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

পাঠ-২.১ **ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি**

পাঠ-২.২ **ফরাসি বিপ্লবের কারণ**

পাঠ-২.৩ **ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ**

পাঠ-২.৪ **ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ**

পাঠ-২.১ ফরাসি বিপ্লবের পটভূমি

জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব বা আলোকময়তার যুগে মানুষের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ মূলত স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের নানা দেশের সাথে যোগাযোগ, নৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগসূত্র মানুষকে অনেক বেশি স্বাধীনচেতা করে তোলে। ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই পরবর্তীযুগের দুর্বল কিন্তু অত্যাচারী শাসকদের দাম্ভিক আচরণ তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র বাস্তিল দুর্গের পতনে যথেষ্ঠ হয়েছিলো। ধর্ম সংস্কার ও প্রতিসংস্কার আন্দোলন ক্রমাগত পরিবর্তনের হাতছানি দিয়ে ফলাফল হিসেবে পোপের শক্তিনাশ করেছিলো। এর মাধ্যমে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য কিংবা ঐ জাতীয় কোনো আধ্যাত্মিকতার বাণী শুনিয়ে মানুষকে আর ঘরে বেঁধে রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না। ফ্রান্সের পাশাপাশি ইউরোপের অন্য দেশগুলোতেও চলছিলো চরম রাজনৈতিক, আমলাতান্ত্রিক, প্রশাসনিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট। এগুলো একত্রিত হয়ে একটি বিপ্লবের পটভূমি তৈরি করে। নিচে বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো–

রাজনৈতিক অবস্থা

কাগজে কলমে ইউরোপের নানা স্থানে জাতীয় রাষ্ট্রের উত্থান হলেও বাস্তবতায় সেখানে শক্তিশালী রাজতন্ত্র বিরাজ করছিলো। দুর্নিবার একনায়কতান্ত্রিক শাসনে ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিলো মানবাধিকার। এখানে ব্যক্তি কিংবা রাজ্যের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে মনে করা হতো রাজতন্ত্রের সম্পত্তি। এখানে ব্যক্তির সাথে রাজ্যের আচরণ ছিলো যাচ্ছেতাই। মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার ও রাষ্ট্র এই ধারণার কোনো অস্তিত্ব সেখানে ছিলো না। বলতে গেলে ক্যালেন্ডারের পাতায় আধুনিক যুগে পদার্পনের চিহ্ন দেয়া থাকলেও তখনকার ইউরোপের মধ্যযুগীয় বর্বর রাজতন্ত্রই নতুন করে জেঁকে বসে। প্রুশিয়া, ব্রান্ডেনবার্গ, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, রাশিয়া, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরণের শাসনকাঠামোর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হলেও ফ্রান্সের অবস্থা ছিলো সবথেকে ভয়াবহ। তাই বিপ্লবীদের প্রতিরোধে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে ফরাসি ভূখণ্ড।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা

ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে পুরো ইউরোপজুড়ে যে রাজনৈতিক সংকট জন্ম নিয়েছিলো তার মূলে ছিলো ভয়াবহ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের ক্ষমতার বুনিয়াদ মজবুত করে তোলার গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়েছিলো শক্তিশালী সব আমলা। রাষ্ট্রযন্ত্রের নামান্তরে তখন গড়ে উঠতে দেখা যায় এক প্রভাবশালী নিপীড়ক যন্ত্রাতন্ত্র যার মূল কাজ জনদলন আর মানুষের উপর নারকীয় অত্যাচার। এই জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে প্রাণান্ত হয়েছিলো পুরো ইউরোপ। নানা স্থানে অসন্তোষের বীজ দানা বাঁধছিলো অনেক আগে থেকেই যা সময় ও সুযোগ বুঝে অঙ্কুরিত হয় ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

প্রশাসনিক অবস্থা

পোপের ক্ষমতার রাজনৈতিকীকরণ আর রাজক্ষমতার উপর চার্চ তথা ধর্মের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পুরো বিশ্ব যখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় উদ্বেল হয়েছে ঠিক তখনি ইউরোপের বইতে থাকে উল্টো হাওয়া। স্বার্থান্বেষী পোপরা ক্ষমতাধর রাজা ও প্রশাসকদের অবস্থার আরো পরিপক্ক করে তুলতে চেষ্টা করে। উপযুক্ত স্বার্থের বিনিময়ে তারা সম্রাটকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়। ফলে আবার সেই মান্ধ্যত্মার আমলের দৈব রাজতন্ত্রের ধারণ ফিরে আসে ইউরোপে। মানুষ নানা দিক থেকে নিষ্পেষিত হয়েও পুরোপুরিভাবে ক্ষমতাসীনদের সমালোচনা করার অধিকার হারিয়ে ফেলে। তবে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্বের ফলে সৃষ্ট ইতিহাস বিখ্যাত ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপের রাজনীতির এই ধারণা পাল্টে দেয়ার পথ করে দেয়।

ধর্মীয় অবস্থা

আধুনিক যুগের শুরুতে ইউরোপের রাজনৈতিক আবর্তনের সাথে ধর্মের ওতপ্রোত সম্পর্ক ছিলো। বিশেষ করে ক্ষমতার উপর পোপের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ এই অবস্থাকে আরো অসহনীয় করে তোলে। ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হলে ইউরোপের ইতিহাসের পট পরিবর্তন হয়। এই সময় থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত। বিশেষ করে মার্টিন লুথারের প্রতিবাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৌলবাদী ক্যাথলিকদের সাথে অন্যদের যে পরিমাণ সংঘাত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আধুনিক যুগের প্রারম্ভের ইউরোপের ইতিহাসকে প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলাটা ভুল হবে না। অনেকে রাজক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নিজের ধর্মমত পাল্টে ফেলেন। অনেক রাজা ভিন্নধর্মী তথা প্রতিবাদী ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষকে নানা ভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন এমনকি নির্মমভাবে হত্যা পর্যন্ত করে।

সময়ের আবর্তে ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্ব হয়ে যায় ইউরোপের জন্য একটি নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার। এই ধরণের একটি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের উপরেই ফরাসি বিপ্লব কার্যকর হয়েছিলো যেখানে মানুষের মূল লক্ষ্য ছিলো গির্জার দাসত্ব থেকে মুক্তি। ক্যাথলিক ধর্মীয় পোপের মৌলবাদী আচরণের বিরুদ্ধে একটি উপযুক্ত জবাব দেয়ার সুযোগ খুঁজছিলো মানুষ যার সুযোগ সহজে মেলেনি। অন্যদিকে পরিবর্তনের বারতা নিয়ে এসেছে ফরাসি বিপ্লব। এর ফলে খ্রিস্টধর্মকে কিছু আচারসর্বস্ব প্রাতিষ্ঠানিকতায় রবিবারের নির্বাসনে পাঠিয়ে বাণিজ্যের পসরা খোলা পোপ এবার নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হন।

অর্থনৈতিক অবস্থা

দাসশ্রম ভিত্তিক ইউরোপের অর্থনীতি এই সময় টিকে ছিলো মূলত নানা স্থানে বিস্তৃত উপনিবেশ থেকে সীমাহীন লুটতরাজ ও সম্পদ আহরণের মধ্য দিয়ে। রাজনেতিক বিশৃঙ্খলা আর ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান হয়েছিলো নিম্নমুখী। অর্থসম্পদ একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনের নেই নিরাপত্তা, রাষ্টযন্ত্রের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অনেকে দেশান্তরী পর্যন্ত হয়েছিলো। অর্থনৈতিক সংকটে জীবন বাঁচানোর দায় যেখানে বড় সেখানে নানা উৎসব আয়োজনের ছুঁতো করে পোপ গণমানুষের কাছ থেকে লুঠ করে নিজের ভাণ্ডার শক্তিশালী করছে। এভাবে একটি দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নিষ্পেষিত ছিলো সাধারণ মানুষ। ক্ষমতার দিক থেকে অনেকটাই ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় ফ্রান্সকে।

তাই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রটি সেখানেই সবার আগে অনেক পরিষ্কার হয়ে সবার চোখে ধরা দেয়। বিশেষ করে সমাজের সবথেকে নিচের স্তরে বসবাস করতো শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণি। তারাই ছিলো ইউরোপের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। উচ্চহারে কর প্রদানের পাশাপাশি নানামুখী শোষণ-নির্যাতনে তাদের জীবন হয়ে উঠেছিলো দুর্বিসহ। রাজা ও রাজকর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত কম কর প্রদানের পাশাপাশি নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাও লাভ করতো। তারা একদিকে বিলাস ব্যসনে জীবনের সবটুকু উপভোগ করার সুযোগ পেতো অন্যদিকে সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকাটাকেই আজন্ম পাপ বলে মনে করতে শুরু করে। একটি সময় দেখা যায় রাজা ও রাজকর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতি আর বিলাসিতায় রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় অনেক রাজ পরিবার বিভিন্ন ধণিক শ্রেণি থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে রথচাইল্ড পরিবার কিংবা ফ্রিম্যাসনারি গ্রুপ থেকে সাহায্য গ্রহণের কথা বলা যেতেই পারে। এক কথায় বলতে গেলে একটি অর্থনৈতিক দৈন্যচক্রে আটকে পড়ে ইউরোপের রাজশক্তি।

সামাজিক অবস্থা

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রায় প্রতিটি দেশের সামাজিক অবস্থা ছিলো দুর্বিসহ। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি তাদের দোসর শোষক শ্রেণি মানুষের উপর নানাভাবে চড়াও হয়। সাধারণ মানুষ যারা সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি তাদের জীবন ধারণই অনেক কঠিন হয়ে গেছিলো। ফ্রান্স থেকে শুরু করে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, ব্রান্ডেনবার্গ, স্পেন, ইংল্যান্ড কিংবা তথাকথিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সবখানেই মানুষের কোনো অবস্থানগত মর্যাদা ছিলোনা বললেই চলে। স্বৈরশাসক ও তাদের দোসদের ছোবলে মানুষ পরিণত হয়েছিলো রাষ্ট্রযন্ত্রের একান্ত বাধ্যগত ভৃত্যে। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণ সামাজিক সাম্যবস্থা নষ্ট করে বিশেষ শ্রেণির প্রাধান্য ও নিপীড়ন স্পষ্ট হয়েছিলো। তবে ফ্রান্সে সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে সংকটময় ছিল।

সংস্কৃতি

জাতি রাষ্ট্রের ধারণা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউরোপে একটি ভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। তবে সময়ের আবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো আধিপত্য বিস্তারের লড়াইকে সবথেকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা শুরু করলে বাধে মূল বিপত্তি। বিশেষ করে ১৮ শতকের স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগণ রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য প্রায়ই অন্য রাষ্ট্রের উপর চড়াও হতেন। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অন্যদেশ দখল করার মাধ্যমে ইউরোপের সংস্কৃতিতেও একটি পরিবর্তন ও অবস্থানিক মিথষ্ক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা জাতিগত দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে দেশ ভ্রমণের মতো ঘটনাও এই সময় ইউরোপের সংস্কৃতি বদলে দিতে সাহায্য করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ আকুল হয়েছিলো স্বাধীনতার স্বাদ নিতে।

উপনিবেশ

ফরাসি বিপ্লবের অনেক আগেই বিশ্বের নানা দেশে ইউরোপের উপনিবেশগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো। বিশ্বের নানা দেশ থেকে সম্পদ আহরণ ও লুটপাট করে তখন সমৃদ্ধ হচ্ছিলো ইউরোপের উপনিবেশিক দেশগুলোর কোষাগার। অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও নানা সংকটে উপনিবেশ থেকে আহরিত সম্পদই অনেক দেশের ভরসা হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় বাইরে থেকে আগত সম্পদে পরিপূর্ণ জাহাজ আক্রমণও নিত্যনৈমিত্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইউরোপের রাজনৈতিক দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে যায় উপনিবেশিত দেশগুলোও। সেখানেও ক্রমাগত বিদ্রোহ চলতে থাকে। কিছুক্ষেত্রে উপনিবেশের যুদ্ধে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের কাছে গেরে গিয়ে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, ভারতে ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স পরাজিত হয়।

সামন্তপ্রথা

মধ্যযুগ থেকে শুরু হওয়া ন্যাক্কারজনক সামন্তপ্রথা ফরাসি বিপ্লব পূর্ব ইউরোপের রক্তে-রন্ধে স্থান করে নেয়। এর প্রভাবে অবস্থানগত সংকটে পড়ে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগণ। তারা নামমাত্র বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সিংহাসন দখল করেছিলো। তবে পুরো শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত হয়ে চলে যায় অত্যাচারী সব সামন্তপ্রভুদের হাতে। এরা অত্যাচার নিপীড়ন করে ইচ্ছাখুশি কর আদায় করে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণির জীবন অসহ্য করে তোলে। নানা স্থানে অঙ্কুরিত বিদ্রোহের বীজ পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে টালমাটাল করে দেয়। অনেক সামন্ত প্রভু নিজস্ব সেনাবাহিনী গড়ে তুলে সুযোগ বুঝে আশেপাশের এস্টেটের সামন্তপ্রভুর সম্পত্তি দখল করতে শুরু করে। তবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রবল ক্ষমতাধর এই ভূ-স্বামী সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার সুযোগ ছিলো না সাধারণ মানুষের। তারা কারণে-অকারণে জীবন দিতে বাধ্য থাকতো তবুও তাদের কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ছিলো না বললেই চলে।

দাস প্রথা

ফ্রান্সসহ ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত মানবতার জন্য মূর্তিমান অভিশাপ হচ্ছে দাসপ্রথা। ভূমিদাসদের মতো নির্যাতিত ও নিপীড়িত অন্য কেউ তখনকার সমাজে ছিলো না। সামন্তবাদী ইউরোপের ভূ-স্বামীদের মূল শক্তি হিসেবে ভূমিদাস প্রথা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নিপীড়ক ভূস্বামীরা এদের উপর কারণে অকারণে নানাবিধ অত্যাচার চালাতে থাকে। সারাদিন শস্যক্ষেতে শ্রম দিয়েও ভূমির উপর তাদের কোনো অধিকার ছিলো না। আমানুষিক অত্যাচার সহ্য করার পরেও তাদের কোনো বেতন ভাতা ছিলো না উপরন্তু ধর্ম প্রতিষ্ঠানসহ নানা ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্ব তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হতো। কর্ভি নামক বিশেষ আইন প্রণয়ন করে তাদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সড়ক নির্মাণ, গৃহনির্মাণ, গির্জার জমিতে বেগার শ্রম, মনিবের পশুর দেখাশোনার পাশাপাশি সড়ক ও সেতুর সংস্কারকাজে বাধ্য করা হতো। তাদের কাছ থেকে ভিংটিনি নামক আয়কর, ক্যাপিটেশন নামক বিশেষ কর, আবাস ভাড়া বাবদ টেইথ, তাইলি নামক রাজস্বের পাশাপাশি কারখানা, পানির কুয়া প্রভৃতির ব্যবহারে ব্যানালিটস নামক কর দিতে হতো। অন্যদিকে অত্যাচারী ভূ-স্বামীদের উপহার-আপ্যায়ন তথা প্রেজেন্টেশন ছিলো তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

মনস্তাত্ত্বিক সংকট

আলোকময়তার দর্শন ইউরোপের গুটিকতক মানুষকে জ্ঞানচর্চার সুযোগ করে দিলেও সাধারণ মানুষ এর থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছিলো। তারা নানাদিক থেকে অত্যাচারিত হয়ে নিজের জীবনের প্রতি মায়া হারিয়ে ফেলে। অনেকটা দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই অনেক কষ্টসাধ্য কাজ হয়ে যায়। তারা জীবন বাঁচাতে বিদ্রোহকে একমাত্র অবলম্বন মনে করে। ভূস্বামীদের প্রশিক্ষিত বাহিনীর কাছে বার বার মার খেতে থাকে তারা। তবুও নানা স্থানে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো তা নেভাতে একটি বড়সড় সফল বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। পরবর্তী পাঠে এই বিষয়গুলো ইউরোপের নানা দেশের পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করলে আরো স্পষ্ট হবে।

পাঠ-২.২ ফরাসি বিপ্লবের কারণ

একটি বা কিছু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কারণে ফরাসি বিপ্লবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়নি। এর পেছনে যুগপৎ অনেকগুলো কারণ কাজ করেছে। আলোকময়তা পরবর্তীকালের আধুনিক ইউরোপের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি প্রায় প্রতিটি দেশেই উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দুটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিলো। মুক্তবুদ্ধি চর্চার পীঠস্থানখ্যাত ফ্রান্সে এই দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব আরো স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এখানে সংস্কারপন্থীগোষ্ঠী বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রাচীন রীতিনীতিকে ঝেড়ে ফেলতে আগ্রহী হয়। অন্যদিকে প্রাচীন রক্ষণশীল মৌলবাদী গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা, কুসংস্কার ও গোঁড়া বিশ্বাসকে আগলে রেখে মানুষের উপর চড়াও হয়। পাশাপাশি অর্থনৈতিক দৈন্যের শিকার নিম্নশ্রেণি এই সময় তাদের অধিকার নিয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে সর্বত্র একটি যুদ্ধংদেহি মনোভাব স্পষ্টত দৃশ্যমান হয়েছিলো। এই অবস্থার মধ্যে অনেকগুলো কারণে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। নিচে ফরাসি বিপ্লবের মূল কারণগুলো তুলে ধরা হলো–

রাজনৈতিক কারণ

ফরাসি বিপ্লবের পেছনে ফ্রান্সের রাজনৈতিক অনিয়ম ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসন অনেকাংশে দায়ী ছিলো। বিশেষ করে বুরবোঁ রাজবংশের কুকীর্তি, শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা, রাজতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতা, সামন্তবাদী শাসন, রাণীদের জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড, আইনগত অসমতা, নাগরিক অধিকার না থাকা, ধর্মীয় মুক্তচিন্তার সুযোগ না থাকার পাশাপাশি চিন্তাজাগতিক ক্ষেত্রে রাজ্যের হস্তক্ষেপ ফরাসি বিপ্লবের পথ করে দিয়েছিলো। এসব রাজনৈতিক কারণে এখানে বিশ্লেষণ করা হলো–

১. **বুরবোঁ রাজবংশের দুঃশাসনঃ** ক্ষমতা দেশ শাসনে বুরবোঁ রাজাদের নানা কুকীর্তি ফরাসিদের বিক্ষোভে ফেটে পড়তে বাধ্য করেছিলো। ১৮ শতকের ইউরোপে অন্য দেশের রাজতন্ত্র যেখানে আস্তে আস্তে মানুষের জন্য কল্যাণকামী হয়ে উঠছে তখন বুরবোঁদের স্বেচ্ছাচারীতা মাত্রা ছাড়িয়েছিলো। চতুর্দশ লুই যেভাবে 'আমিই রাষ্ট্র' এই ধরনের ধারণা প্রচলন করেছিলেন এই যুগের রাজাদের মধ্যেও তার রেশ ছিলো। রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার অনর্থক প্রয়োগ ঘটাতে গিয়ে শাসনক্ষেত্রের অবস্থা ছিলো শোচনীয়। রাজ্যের প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে আইন, বিচার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজা ছিলেন সর্বেসর্বা। এই সময় রাজার ক্ষমতাকে চূড়ান্ত প্রমাণ করতে সবগুলো প্রতিনিধিত্বমুলক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেয়া হয়। ষোড়শ লুই বেশ দম্ভের সাথে ঘোষণা করেন 'ফরাসিদের সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র তার উপর ন্যস্ত তাই আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতাও তাঁর'। আর তাঁর ইচ্ছার উপর ভিত্তি করেই স্ট্রেটস-জেনারেল নামক আইনসভা পর্যন্ত ভেঙে দেয়া হয়েছিলো। লুইয়ের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে তাকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেপ্তার করে নির্যতন চালানো এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হতো। লেটা দ্য ক্যাস্তে (Lettre de Cachet) নামে পরিচিত নিকৃষ্টতম এক আইনে প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে অনেক মানুষকে গ্রেপ্তার-নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছিলো।

২. **শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলাঃ** রাজার সর্বময় ক্ষমতার প্রদীপের নিচের অন্ধকার হিসেবে ফ্রান্সে বিদ্যমান ৪০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের কথা বলা যেতে পারে। রাজা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকার হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে নানামুখী প্রভাব খাটালেও মূল ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিলো স্থানীয় সরকারের প্রশাসকদের হাতে। এই সমস্ত স্থানীয় সরকারের প্রধান ইনটেনডেন্ট ও তার কর্মচারীরা জনগণের উপর নানামুখী অত্যাচার চালাতো। রাজার নির্যাতনের সাথে তাদের নির্যাতন একীভূত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয় সাধারণ মানুষের জীবনে। এইক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাজকর্মচারী ছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী, যারা জনগণের কল্যাণের থেকে নিজেদের অবস্থা উন্নয়নে অধিক সচেষ্ট ছিলেন। ফলে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা, অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপের আধিক্য থেকে শুরু করে নানা অনাচার দেখা দেয়।

৩. **রাজতন্ত্রের সীমাহীন ক্ষমতাঃ** ফরাসি রাজতন্ত্রের ক্ষমতাকে সর্বময় করতে অন্যসব ক্যাথলিক প্রধান দেশগুলোর মতো ফ্রান্সেও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত করানোর একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে রাজার অপকর্মে বৈধতা দিয়ে সহায়তা করেন পোপ। দৈব রাজতন্ত্রে সর্বময় ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত হওয়ার ফলে প্রশাসক হিসেবে যতটা ব্যর্থই হন রাজা হয়ে ওঠেন অত্যাচারের প্রতীক। পোপ সমর্থিত দৈব ক্ষমতার বলে রাজ্যশাসনের নামে স্বেচ্ছাচারিতামূলক একনায়কতন্ত্রকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলা হয় যা ছিলো মানবতা পরিপন্থি। পোপের মাধ্যমে ক্ষমতার

সর্বজনীন অবস্থান লাভ করে আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন রাজা যেখানে কৃতকর্মের জন্য তিনি পার্লামেন্ট বা জনগণ কারো কাছে দায়ী ছিলেন না। আইন প্রণয়ন, কর প্রবর্তন, কোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, চুক্তি সম্পাদন থেকে শুরু করে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ছিলো একমাত্র রাজার।

৪. **সামন্তবাদী শাসনঃ** নামেমাত্র আধুনিক যুগের প্রত্যাবর্তন করলেও মধ্যযুগীয় বর্বর সামন্তপ্রথা ফ্রান্সের মাটি থেকে তখনো চিরতরে বিলুপ্ত হয়নি। সামন্তপ্রভুদের নারকীয় অত্যাচার নির্যাতন আর অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষকে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মানবেতর অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্রের প্রভাবে রাজার সকল নির্দেশ মানতে জনগণের গলদঘর্ম হতে হতো। সেই সাথে সামন্ত প্রভুর শোষণ আর নারকীয় নির্যাতন অনেকটাই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘাঁ হিসেবে দেখা দেয়। সামন্তবাদী অর্থনীতিতে কৃষক তার ভূমির মালিকানা লাভ করেনি। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রম দেয়া থেকে শুরু করে সবকিছু তাকেই করতে হতো। পাশাপাশি সামন্ত প্রভুরা নিজেদের অবস্থান সমুন্নত করতে পোপদের সাথে সম্পর্ক সবসময় ভালো রাখতে চাইতো। তাই তাদের খুশি করতে মানুষ সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে গির্জার জমিতে বেগার শ্রম দিতো যার বিনিময়ে খাদ্য বা পারিশ্রমিক কিছুই মিলতো না। রাজা ও পোপের প্রিয়পাত্র ভূ-স্বামী তথা সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের অর্জিত সম্পদে বিলাসব্যসনে দিনাতিপাত করতেন অন্যদিকে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ নিম্নগামী হতে থাকে। সময়ের দাবি মেটাতে তাদের সামনে বিপ্লবী হয়ে ওঠা বাদে দাবি আদায়ের আর কোনো বিকল্প পথ ছিলো না।

৫. **রাণীদের জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ডঃ** ফরাসি রাজতন্ত্রের দুর্বলতম দিক হচ্ছে ফরাসি রাজ দরবার থেকে শুরু করে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাণীদের অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ। অনেক যোগ্য প্রজাহিতৈষি মন্ত্রী রাণীদের প্রিয়পাত্র না হওয়াতে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। পশ্চদশ ও ষোড়শ লুইয়ের দরবারে তাদের রাণীর প্রভাব ছিলো চোখে পড়ার মতো। এক কথায় বললে ষোড়শ লুইয়ের রাণী অ্যান্টয়নেট হয়ে ওঠেন তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যমণি। তাইতো তুর্গোর মতো একজন বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অর্থনীতিবিদকে মন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ষোড়শ লুই। দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই রাণী ও দরবারের স্বার্থন্বেষী চক্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এভাবে রাণীদের অযৌক্তিক শক্তি প্রয়োগ আর অনাকাঙ্খিত ভূমিকা ফরাসি রাজতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে আঘাত করে আস্তে আস্তে দুর্বল করতে থাকে ক্ষমতা কাঠামো।

৬. **আইনগত অসমতাঃ** ফরাসি সামন্ততন্ত্রে একই আইন প্রায়োগিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক লাভ করেছিলো। বলতে গেলে আইন প্রয়োগের এই অসম অবস্থানই প্রশাসনযন্ত্রকে নামান্তরে একটি নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে রূপ দিয়েছিলো। যেখানে মানুষের অধিকারের কথা বলাটা ছিলো উপহাসের সমতূল্য। বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সের সর্বত্র একটি নির্দিষ্ট আইনের বদলে রাজ্যভিত্তিক আইন প্রচলিত ছিলো। এক্ষেত্রে রোমান আইনে পরিচালিত দক্ষিণ ফ্রান্সের সাথে উত্তর ও মধ্য ফ্রান্সের আইনের পার্থক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা স্থান বদল করতো। এভাবে দোষী ব্যক্তিরা খুব সহজেই উপযুক্ত শাস্তি থেকে বেঁচে যেতো। জানা যায় পুরো ফ্রান্স জুড়ে প্রায় ৪০০ টির মতো ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত হয়েছিলো যেগুলোর অধিকাংশ ল্যাটিন ভাষায় হওয়াতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হতো না। তখনো হেবিয়াস-কর্পাস প্রবর্তন হয়নি। এর বদলে প্রচলিত কঠোর আইনে মামুলি অপরাধেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করার পর্যন্ত বিধান রাখা হয়েছিলো।

৭. **নাগরিক অধিকার না থাকাঃ** নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে সবার আগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের কথাটি বলতে হয় যা তখনকার ফ্রান্সে এক অসম্ভব বলে বিবেচিত হতো। মানুষ জন্মগতভাবে রাষ্ট্র ও রাজার অধীন এখানে তার স্বাধীন সত্তা বলতে কিছু রাখা হয়নি। মানুষ তার প্রতিটা কর্মকাণ্ড তা ভালো কিংবা খারাপ যাই হোক এটা নিয়ে রাজার কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য ছিলো। বিশেষ করে তখনকার রাষ্ট্র চাইলে বিনা বিচারে যে কোনো মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় আটকে রাখতে পারতো। তখনকার দিনের ফ্রান্সে গুপ্ত আটক নামে একটি বিশেষ প্রথা চালু হয়েছিলো। এভাবে আটক করে অনেক মানুষকে বিরোধিতা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। অনেককে ছেড়ে দিলেও বেশিরভাগ মানুষকে হত্যা ও গুম করা হয়েছে। অপরাধী তথা বিদ্রোহীদের আটক করে রাখার মতো এমন অনেক জেলখানা তখন গড়ে উঠেছিলো যার মধ্যে ইতিহাসবিখ্যাত বাস্তিল কারাদুর্গ অন্যতম।

৮. **ধর্মীয় ও চিন্তাজাগতিক ক্ষেত্রঃ** অগসবার্গের সন্ধির পর রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম এমন নীতি প্রতিষ্ঠা পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের বাধ্যতামূলক ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত করা হয়। ধর্ম বিশ্বাস যার যার আর

দেশটা সবার এমন ধারণা তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। মানুষ তার চিন্তাজাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। অন্যদিকে গ্রন্থ প্রকাশ ও সংবাদপত্র ছাপানোর ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হতো। এক্ষেত্রেও রাজার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাটা প্রায় অসম্ভব ছিলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় প্রতিবাদী লেখনীর কারণে ভলতেয়ারের কারাবরণের কথা। অন্যদিকে বার সংস্কার, পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্ম ততোদিনে একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। কিংবা ক্যাথলিকদের অত্যাচারের অতিষ্ট অনেক প্রজা চাইছে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে দীক্ষিত হবে। এক্ষেত্রে উভয় চিন্তার মানুষের উপরেই নেমে আসে বিভীষিকাময় নির্যাতনের ঘটনাগুলো।

অর্থনৈতিক কারণ

মুদ্রাস্ফীতি, তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফ্রান্সের মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহ্য করে তুলেছিলো। অর্থনীতি সমাজের কতিপয় মানুষের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ায় বাকিরা প্রান্তিক হয়ে পড়ে। কিছু ক্ষমতাবান মানুষের জীবন যেখানে আনন্দ উপভোগের এক অনন্য মাধ্যম বাকিদের কাছে সেই জীবন এক মূর্তিমান অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। এই ধরনের একটি পরিস্থিতি ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচনা করে। বিভিন্ন শ্রেণির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এক ধরনের উল্লেখযোগ্য বৈষম্য সুস্পষ্ট হয়েছিলো।

১. **অর্থনৈতিক দায়িত্বঃ** রাষ্ট্রকে কর প্রদান থেকে শুরু করে একজন নাগরিকের আরো কিছু অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু ফরাসি-বিপ্লব পূর্ব ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি দিলে এক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে তখনকার ফ্রান্সের দিকে দৃষ্টি দিলে আমাদের দুই ধরনের জনগোষ্ঠীর ধারণা মেলে। প্রথমত অধিকারভোগী এবং দ্বিতীয় অধিকারবিহীন এই দুটি শ্রেণি তখনকার ফ্রান্সের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের প্রথমোক্তটি কোনো ধরনের কর প্রদান না করে রাষ্ট্রের প্রায় সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতো। অন্যদিকে দ্বিতীয় শ্রেণি কর প্রদান করেও রাষ্ট্রের সকল সুযোগ, সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো। দার্শনিক কিংবা সাহিত্যিক তাদের লেখনী বা বর্ণনায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটই যে কোনো বিপ্লবকে উস্কে দিতে যথেষ্ঠ তা ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে আরেকবার প্রমাণিত হয়। তাই ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের সময় থেকে থেকে অর্থনৈতিক সংকটের সূচনা হয়েছিলো তা ফরাসি বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

২. **ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থাঃ** ফ্রান্সের কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ও ছিলো অযৌক্তিক, বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ। অভিজাত শ্রেণিই বলতে গেলে ফ্রান্সের বেশিরভাগ ভূমি তাদের দখলে রেখেছিলো কিন্তু তারা ছিলো করের আওতার বাইরে। তারা করের বাইরে থাকায় রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। প্রতি বছরের অর্থনৈতিক ঘাটতি ক্রমশ বেড়ে গেলে তার অতিরিক্ত চাপ প্রদান করা হতো নিম্নশ্রেণির উপর। কৃষকরা অভিজাতদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হওয়ার পাশাপাশি তাদের অতিরিক্ত করের ভার বহন করতে গিয়ে নুইয়ে পড়ে। টেইল, ক্যাপিটেশন কিংবা ভ্যাঁতিয়াম এই তিন ধরনের করের ক্ষেত্রেই একটি চূড়ান্ত ধরনের অনিয়ম চোখে পড়ে। বিশেষ করে টেইল ছিলো ভূমিকর যা থেকে মুক্তছিলো যাজক (1^{st} Estate) ও অভিজাত সম্প্রদায় (2^{nd} Estate)। তবে তৃতীয় শ্রেণি এই কর দিতে বাধ্য ছিলো। উৎপাদন ভিত্তিক আয়কর ক্যাপিটেশন সমাজের সকল স্তরের মানুষের উপর জারি হওয়ার বিধান থাকলেও যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় অনেক ছল-ছুঁতোয় এর থেকে অব্যাহতি পেতো। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর জারিকৃত কর বা ভ্যাঁতিয়াম থেকেই নানাভাবে মুক্তি পেয়ে যেতো অভিজাত সম্প্রদায় কিংবা যাজকগণ। ফলে প্রত্যক্ষ করের প্রত্যেকটির ভারই এসে পড়তো তৃতীয় শ্রেণির(3^{rd} Estate) উপর। মন্ত্রী তুর্গো হিসেব করে বের করেন ফরাসি কৃষকগণ তাদের মোট আয়ের পাঁচভাগের চারভাগই কর হিসেবে দিয়ে দিতো। চার্চ তাদের থেকে টাইদ (Tithe) বা ধর্মকর আদায় করতো, জমিদার আদায় করতো টেইল। করভারে জর্জরিত ফ্রান্সের কৃষকরা বছরের বেশিরভাগ সময় কেবলমাত্র আলু খেয়ে জীবন ধারণ করতো। ত্রুটিপূর্ণ কর পদ্ধতির কারণে রাজকর্মচারী ও জমিদার এমনকি চার্চের রক্ষীদের হাতে পর্যন্ত নির্যাতিত হতো অসহায় কৃষক। আর এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীই পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবের মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলো।

৩. **অর্থনৈতিক ভ্রান্তির জাদুঘরঃ** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে কর আদায়ে নানাবিধ অনিয়ম ও জটিলতা বিশ্লেষণ করে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ ফ্রান্সকে 'অর্থনৈতিক ভ্রান্তির জাদুঘর' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অনেক সময়

এককালীন কর সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা অভিজাতদের ইজারা দেয়া হতো। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকায় পুরো জমির ইজারা লাভ করেও তাদের সন্তুষ্টি মেলেনি। অনিয়মতান্ত্রিক ও অনির্ধারিতভাবে ইচ্ছেখুশি কর আদায় করে কৃষকদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছিলো তারা। একদিকে করের নিয়মতান্ত্রিক বৈষম্য অন্যদিকে আদায়ের অযৌক্তিক কঠোরতা কৃষকদের জীবনকে মূর্তিমান অভিশাপে পরিণত করে। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ শুল্কপ্রথা এক স্থান হতে অন্যস্থানে পণ্য বিনিময়ে বিশেষ জটিলতার জন্ম দেয়। এটাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রের শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নানা উপায়ে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করা শুরু করে। বণিকদের উপর তাদের অকথ্য অত্যাচারে ব্যবসা বাণিজ্যে পর্যন্ত ধ্বস নামে। এভাবেই ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিলো।

৪. **শূন্য রাজকোষঃ**চতুর্দশ লুই ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধগুলোর ফলে ফরাসি রাজকোষ চাপের মুখে পড়ে। তিনি তাঁর পরবর্তী রাজা পঞ্চদশ লুইকে অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোযোগী হতে নির্দেশ দিলেও তিনি তার কথার পরোয়া করেননি। পঞ্চদশ লুই অনিয়ন্ত্রিত বিলাস-ব্যাসনের পাশাপাশি আরো কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ফরাসি রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। পোল্যান্ডের বিভাজন সম্পর্কিত যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দৈন্যদশা আরো পরিষ্কার হয়েছিলো। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে বসেন তখন প্রায় ভেঙে পড়েছিলো ফরাসি অর্থনীতি। অহেতুক কর্মচারী ও কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি, রাজপ্রাসাদের অতিরিক্ত ব্যয় ও রাণীদের বিলাস-ব্যসন ফ্রান্সকে ঋণের ভারে জর্জরিত করে। ১৭৮৮ সালের দিকে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যেখানে রাষ্ট্রে মোট আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ ঋণশোধ ও প্রতিরক্ষা খাতেই ব্যয় হতো।

৫. **নেকারের অপসারণঃ**ফরাসি অর্থনীতির দুর্দিনে ত্রানকর্তার ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ নেকার। অ্যাডাম স্মিথের পর তাঁকে অনেক যোগ্য অর্থনীতিবিদ হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্থান দেয়া হয়। তিনি ক্ষমতা লাভ করে সবার আগে করনীতির পুনর্বিন্যাসে মনযোগী হন। তিনি লক্ষ করেন ফ্রান্সের অধিকারভোগী শ্রেণি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কোনো কর প্রদাণ করেনা অন্যদিকে অধিকারবিহীন শ্রেণির উপর নানাবিধ কর চাপানো থাকলেও তাদের সে কর প্রদাণের সক্ষমতা নেই। তাই ক্ষমতা পেয়েই তিনি বিভিন্ন দমনমূলক কর বাতিল করে প্রতিটি শ্রেণির উপর করের সমবন্টন করেন। তিনি বিশেষ শ্রেণির আর্থিক সুবিধা বন্ধ করা, কঠোর হাতে শুল্ক খাতের দুর্নীতি দমন ও প্রশাসনিক অমিতব্যয়িতাকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেন। কিন্তু রাণীর প্ররোচনায় তাকে অপসারণ করে ষোড়শ লুই নিজে হাতে ফ্রান্সের দুর্দিন আরো ঘনীভূত করেন। বলতে গেলে নেকারের অপসারণের মাধ্যমে ফরাসি অর্থনীতিতে নতুন করে যে সংকট তৈরি হয় তা বিপ্লবকে আরো অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৬. **মুদ্রাস্ফীতিঃ** মন্ত্রী নেকারের অপসারণ উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। রাণী ও অভিজাতদের ভূমিকার সামনে রাজার অসহায় অবস্থান জনগণের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা যায় যা রাষ্ট্রকে চরম দেউলিয়াত্বের সম্মুখীন করে। অনিয়ন্ত্রিত ও অযৌক্তিক করপ্রথা মুদ্রাস্ফীতিকেও প্রবল করে তোলে। ডেভিড থমসন দেখিয়েছেন প্রায় ৬৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও সেই অনুপাতে মানুষের আয় একদম বাড়েনি যা ফরাসি বিপ্লবের আগমণ ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য রুটির মূল্য শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ শ্রমিক ও চাকুরীজীবীদের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্ধাহার, অনাহার ও আর রুটিদাঙ্গা হয়ে ওঠে তখনকার ফ্রান্সের নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার।

৭. **মঙ্গা ও খাদ্য সংকটঃ** অনিয়মতান্ত্রিক কর আদায় ও নির্যাতনে কৃষকদের অবস্থা যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তখন ফ্রান্সে ভয়াবহ মঙ্গা দেখা দেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ১৭৮৮ সালের ফ্রান্সে ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে। জীবন বাঁচানোর তাগিয়ে হাজার-হাজার বুভুক্ষু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দেয় এবং প্যারিসে এসে সমবেত হতে থাকে। ক্ষুধার্ত মানুষ শহরে এসে বাকিদের বিলাস ব্যসনের জীবন দেখে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা এখানে এসে একইসাথে দেখতে পায় নিজেদের দৈন্য আর তাদেরই হাতে উৎপাদিত ফসলে শহুরেদের অযৌক্তিক বিলাসিতা। এক টুকরো রুটির সন্ধানে তারা প্যারিসের নানা স্থানে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও লুটপাট করতে থাকে। এমনি প্রেক্ষাপটের উপর ১৭৮৯ সালে দিকে ফ্রান্সের অনেকগুলো গ্রামে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয় যা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দেশ জুড়ে।

সামাজিক কারণ

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আর অর্থনৈতিক অব্যবস্থার মতো সামাজিক অসমতা ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের শাসনতান্ত্রিক বৈষম্য মানুষকে হতাশ করে তোলে। বিশেষ করে কর না দিয়েও রাজ্যের সকল সুবিধালাভকারী যাজক ও অভিজাতদের কর্মভূমিকা সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ট করে তোলে। পক্ষান্তরে কর দিয়েও রাজ্যের সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত এই শ্রেণি তাদের সামাজিক জীবনের দুর্বলতা বেশ ভালোভাবে অনুভব করে। পাশাপাশি অভিজাত শ্রেণির অনেক দুর্বৃত্তের হাতে অনেক নিম্নশ্রেণির নারী ক্রমাগত লাঞ্ছিত হয়। অনেক কৃষকের সামনে থেকে তার স্ত্রী কিংবা মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে ঘৃণ্য লালসা চরিতার্থ করেও পার পেয়ে যায় অনেক অভিজাত। এই ধরনের বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সংখ্যায় মাত্র তিন লক্ষ হয়েও উপরের দুইটি শ্রেণি পুরো ফরাসি জাতির উপর স্কন্ধের মতো চেপে বসেছিলো। তখনকার সমাজের ফার্স্ট-এস্টেট বা যাজক শ্রেণি, সেকেন্ড-এস্টেট বা অভিজাত শ্রেণি আর থার্ড-এস্টেট তথা মধ্যবিত্ত ও উৎপাদনকারী শ্রেণির জীবন-যাপন প্রণালিতেও ছিলো ঘোর পার্থক্য। তাই ১৭৮৯ সালে এসে এই সামাজিক অসমতাই হয়ে যায় বিপ্লবের মূলকথা।

১. **যাজক শ্রেণির দৌরাত্বঃ** ফরাসি সমাজের প্রথম শ্রেণিভুক্ত যাজকরা সব মিলিয়ে সংখ্যায় ততটা বেশি ছিলো না। তবুও অবস্থানগত কারণে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা লাভ করে আসছিলো তারা। বিশেষ করে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার যাজকের দ্বারা পুরো ফ্রান্সের ধর্মকর্ম নিয়ন্ত্রিত হতো। অনেকগুলো রাজনৈতিক, বিচার প্রক্রিয়াগত ও সামাজিক সুবিধা লাভ করে দিনের পর দিন যাজকদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ স্পষ্ট হতে থাকে। এরা স্থাবর সম্পত্তি ও টাইদ (Tithe) নামে পরিচিত বিশেষ করের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিলো। গির্জার নামে অর্থ উপার্জিত হলেও বিলাস-ব্যসনে তারা অভিজাতদের থেকে কম যেতো না। ভলতেয়ারের হিসেব অনুযায়ী একাধারে শহর ও গ্রামে বিস্তৃত চার্চের স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়ের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৯ কোটি লিভার। নেকার যে সংশোধিত হিসেব পেশ করেন সেখানে চার্চের আয় দেখা যায় প্রায় ১৩ কোটি লিভারের মতো। স্বেচ্ছাদান ও দেমিস এর মতো নামমাত্র কর তাদের আয়ের হিসেবে নিতান্তই তুচ্ছ ছিলো। নিজস্ব প্রাসাদ, দুর্গ ও গির্জা নিয়ে আভিজাত্যের প্রশ্নে অন্যদের থেকে কোনো অংশেই পিছিয়ে ছিলো না যাজকবর্গ। অনেকটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠেছিলো ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক গির্জাগুলো যাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণে যার পর নাই বিরক্ত হয়েও মুখ খুলতে পারেনি সাধারণ মানুষ। তবে উর্ধ্বতন যাজক আর অধস্তন যাজক সে যেই হোক তাদের বেশিরভাগই অভিজাতশ্রেণি থেকে উদ্ভুত। তাই বিশপ, ক্যানন কিংবা মঠাধ্যক্ষ এদের কারো চিন্তা চেতনাতে সাধারণ মানুষের অধিকারের ছিঁটেফোঁটা পর্যন্ত স্থান পেতো না। গবেষণায় জানা যায় ফরাসি-বিপ্লবের পটভূমিতে ফ্রান্সের নানা স্থানের প্রায় ১৪০ জন বিশপের সবাই ছিলেন অভিজাত। তাদের হাতে থাকা গির্জার প্রায় সকল সম্পত্তি আস্তে আস্তে তাদের বিলাস ব্যসনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। রাজপ্রাসাদের দরবারি অভিজাতদের মতো উর্ধতন যাজকগণও মদ্যমান, নারীসঙ্গ, জুয়া খেলা থেকে শুরু করে বিবিধ অপকর্ম করে ভার্সাই নগরীতে উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করতেন। অধস্তন যাজকদের অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না। তাদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নানারকম কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখা হতো। তবে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এই অধস্তন যাজকরা আস্তে আস্তে উর্ধ্বতন যাজকদের অপকর্ম সম্পর্কে জেনে গিয়ে তাদের বিরুদ্দে সোচ্চার হয়েছিলেন। এদের কাউকে নাস্তিক কিংবা ধর্মদ্রোহী বলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চললেও মূল সত্য শেষ পর্যন্ত অজানা থাকেনি। ধীরে ধীরে ফ্রান্সের মানুষ গির্জা ও বিশপদের এই ধর্মভিত্তিক ষড়যন্ত্রকে রুখে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলো। তবে বেশিরভাগ বিশ্লেষক মনে করেন অধস্তন ও উর্ধ্বতন যাজকদের এই বিবাদ ফরাসি বিপ্লবকে প্ররোচিত করেছিলো।

২. **অভিজাত শ্রেণিঃ** ফরাসি সমাজের স্তর বিন্যাসে যাজক শ্রেণির পরেই অবস্থান ছিলো অভিজাতদের। তারা কর না দিয়েও বেশিরভাগ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করতো। চার্চ ও যাজকদের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলো। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তাদের সংখ্যা মাত্র তিন লক্ষাধিক হলেও এই নগন্য সংখ্যা নিয়ে তারা পুরো সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করলেও তারা ছিলো প্রতিটি নাগরিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত। পাশাপাশি রাজ দরবারের অভিজাতগণ নানা ধরনের বৃত্তি, ভাতা ও অনুদান লাভ করতো যা ছিলো অবাস্তব ও অনৈতিক। এই সময় ফ্রান্সের প্রশাসন ও বিচার বিভাগের সম্প্রসারণে আরেক শ্রেণির পোশাকী অভিজাত শ্রেণি উৎপত্তি লাভ করে। এদের

বেশিরভাগের শিকড়ই উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে প্রোথিত ছিলো। ফ্রান্সের নানা স্থানে অনুৎপাদনমুখী অবস্থা আর মঙ্গার প্রভাবে আর্থিক সংকটে পড়েন অভিজাতরাও। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ শোষণ করেই তারা দিনাতিপাত করতেন। তবে সেই নিম্নশ্রেণিই যেখানে খাদ্যাভাবে ধুঁকছে তাদের অবস্থা খারাপ হওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক। এর পরেও অনেক অভিজাত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। সময়ের আবর্তে তারা সামাজিক মানুষের শত্রু এক প্রতিক্রিয়াশীল জাতিতে পরিণত হয়। তাদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তশ্রেণি ধীরে ধীরে সংঘটিত হতে থাকে। অভিজাতদের অযৌক্তিক সুবিধালাভ, অনর্থক অত্যাচার নিপীড়ন আর ভোগ-বিলাস দেখে সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শ্রেণি সংঘাত স্পষ্ট করে। এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বিস্ফোরণে রূপ নেয়।

৩. **মধ্যবিত্ত শ্রেণিঃ** যাজক সম্প্রদায় আর অভিজাতদের পরে সমাজে অবস্থান ছিলো মধ্যবিত্তদের। তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক সুযোগ সুবিধা লাভ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্বও পালন করতো। বিশেষ করে অনেক সরকারী চাকুরে, গ্রামীণ কৃষক, বণিক,পুঁজিপতি, শিল্পপতি, আইনজীবি, চিকিৎসক ও শিক্ষক শ্রেণির মানুষ এর আওতায় পড়তেন। এদের বেশিরভাগ শহরবাসী হলেও গ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। বিশেষ করে মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষ যারা শহরে বাস করতেন তাদের বেশিরভাগ আত্মীয় স্বজন বাস করতেন গ্রামে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের পর বুর্জোয়া শ্রেণি যে ধরনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলো ফ্রান্সের অবস্থা তেমনটি ছিলো না। তবুও গ্রামবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে তারা ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে মূল কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফ্রান্সে সামন্ত প্রথার সুবাদে মধ্যবিত্তশ্রেণি সেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তবে সংখ্যায় কম হলেও শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এই শ্রেণি সব সময় অভিজাতদের থেকে একধাপ এগিয়ে ছিলো। বিশেষ করে বিদ্যা-বুদ্ধি ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো যা তাদের অভিজাতদের থেকে পৃথক করেছিলো। নিম্নশ্রেণির মতো রাষ্ট্রের রাজস্ব ও ব্যয়ভার বহন করেও তারা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবহেলিত ছিলো। এই ধরণের বৈষম্যের নীতি মধ্যবিত্তশ্রেণিকে প্রথম দুইটি শ্রেণির ঘোর বিরোধী ও প্রতিবাদী করে তোলে। পাশাপাশি শিক্ষিত হওয়ায় অনেক দার্শনিকের নীতিগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছিলো তাদের। তারা জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে গিয়ে কখনোই পূর্বতন কুসংস্কারে পাশাপাশি ধর্মের দোহাই দিয়ে চার্চের অপকর্মগুলো মেনে নিতে নারাজ ছিলো। তাই সমাজ ব্যবস্থা সংস্কারে উদ্যোগী হয়ে তারাই ফরাসি বিপ্লবের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলো।

৪. **কৃষক ও শ্রমিকঃ** অভিজাত ও যাজকদের অত্যাচার ও নানামুখী শর্তের মধ্যে বাস করতে গিয়ে যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণি অনেক যন্ত্রণার শিকার হয়েছে সেই তুলনায় কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়। অভিজাতদের শোষণ আর চার্চের নানামুখী বিধিনিষেধের মধ্যে বাস করা এই কৃষক-শ্রমিক অনেকটা ছিল জীবন্মৃত। রাষ্ট্রের সকল ব্যয়ভার নানামুখী করের মাধ্যমে তারা বহন করলেও এর বিনিময়ে তাদের মিলতো নানামুখী অবহেলা, অত্যাচার ও নির্যাতন। অত্যাচারী সামন্ত প্রভুর শোষন আর আর চার্চের বিশপের আজগুবি নানা নিয়মের জালে নিষ্পেষিত ছিলো তাদের প্রতিটি দিন। অভুক্ত অবস্থায় বেশিরভাগ সময় খুব ভোরে ক্ষেত-খামার কিংবা কারখানায় কাজ শুরু করে যারা প্রতিদিনের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সচল করতো সন্ধার পর তারা হারিয়ে যেতো ফ্রান্সের হিসেবের খাতা থেকে। নৈশ ক্লাবের হৈ-হুল্লোড় কিংবা ফরাসি অভিজাতদের আলোচনার টেবিল কোথাও স্থান হতোনা এই হতভাগ্যদের। তাদের জন্মই ছিলো একটি মূর্তিমান অভিশাপ যা খণ্ডাতে আজীবন নিঃস্বার্থ শ্রম দিয়ে যেতে হতো। এই দুঃখ দুর্দশা ও অত্যাচারের মুখেও ধীরে ধীরে কৃষক-শ্রমিকের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে আরো বেড়ে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল উৎপাদিত না হলেও কৃষকদের উপর থেকে করের ভার হালকা করা হয়নি বরং চলেছে নানামুখী নিপীড়ন-নির্যাতন। ধীরে ধীরে সংখ্যায় বেড়ে যাওয়া কৃষকশ্রেণি তাদের আহারের সংস্থান করতে না পেরে বিদ্রোহের পথ খুঁজে নিয়েছে। তারা দেখিয়ে দেয় অসহায় নিরীহ এই মানুষগুলো কোদাল-লাঙল দিয়ে মাঠে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করতেই শুধু জানে না, প্রয়োজনে অত্যাচারী শোষকদের রক্তও ঝরাতে পারে। তাদের প্রতিবাদে ধ্বনিত হয় অনর্থক কর প্রদানের দিন শেষ, ধর্মের নামে গির্জার জমিতে বেগার শ্রম দেয়ার দিন শেষ। পুরো ফ্রান্স জেগেছে অভিজাততান্ত্রিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সময় হয়েছে বিপ্লবের।

জ্ঞানতাত্ত্বিক কারণ

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বৈষম্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক অধিকার হরণ মানুষকে নানাদিক থেকে হতাশ ও বিদ্রোহী করে তোলে। মানুষের মাঝে বিদ্যমান চাপা ক্ষোভ আর এই বিদ্রোহকে বৃহৎ ও কার্যকর বিপ্লবে রূপ দিতে সহায়তা করে জ্ঞানতাত্ত্বিক জাগরণ। বলতে গেলে ফরাসি বিপ্লব শুরুর অনেক আগে থেকেই ভাবজাগতিক বিপ্লব শুরু হয়েছিলো। ১৮ শতকে ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিলো তা ফরাসি বিপ্লবকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণি তারা ছিলো শিক্ষিত ও জ্ঞান অনুরাগী ফলে নানা দার্শনিকের অভিমত খুব সহজেই ফরাসি বিপ্লবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো। এক্ষেত্রে ফ্রান্সের সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রজীবনের থাকা নানা অন্যায়, অসমতা ও দুর্গতি নিয়ে রচিত এই লেখাগুলো মানুষের মনে বিপ্লবী ভাবতরঙ্গের সঞ্চার ঘটায়। এর থেকে মানুষ খুঁজে নেয় তাদের প্রতিবাদের ভাষা, ধীরে ধীরে একত্রিত হতে থাকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালে সংঘটিত গৌরবময় বিপ্লব ও জন লকের (John Locke) রাজনৈতিক দর্শন ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলো বলে ধারণা করা হয়। এই বিষয়টি নিচে অলোচনা করা হলো–

১. **মন্টেস্কু:** ফরাসি বিপ্লবকে যাঁরা সরাসরি প্রভাবিত করেছিলেন তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একজন তাত্ত্বিক মন্টেস্কু কিছুদিন ইংল্যান্ডে বাস করে সেখানকার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেন। তিনি ফ্রান্সের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জনদুর্ভোগ দেখে অনেক হতাশ হয়েছিলেন। তবে ইংল্যান্ড থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে বিপ্লব বিমুখ ও রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এই ফরাসি তাত্ত্বিক অনেক সরকার বিরোধী কথা বলে ফেলেন যা ফরাসি বিপ্লবকে আরো তুঙ্গে নিয়ে যায়। বিশেষ করে ধর্মের নামে মঠ কেন্দ্রিক ব্যবসার পাশাপাশি শাসনতান্ত্রিক নানা অনিয়ম ও লাগামহীন স্বৈরতন্ত্রের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। 'দি পার্সিয়ান লেটার্স (The Persian Leters)' গ্রন্থে তিনি ঐ সময়ের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করে গেছেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের দাবি নিয়ে তিনি রচনা করেন দি স্পিরিট অব ল'জ (The Sprit of Laws) আরেকটি বিখ্যাত বই। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা যে বিধান জারি করেছিলো সেখানেও যথেষ্ঠ প্রভাব রেখেছিলেন মন্টেস্কু।

২. **ভলতেয়ার:** ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে প্রতিবাদী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন ভলতেয়ার। তিনি ১৮ শতকের সংস্কারবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ভলতেয়ার মহান ফ্রেডারিখের দরবারের একজন আমন্ত্রিত অতিথি হওয়ার পাশাপাশি রুশ রাণী দ্বিতীয় ক্যাথরিনের সাথেও পত্র যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, ইতিহাসবিদ, নাট্যকার, রম্যলেখক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি চার্চের বিভিন্ন দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি মুক্তমত প্রকাশ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ছিলেন। রাজতন্ত্রের ঘোর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রচলিত শাসন কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য সংস্কারের পক্ষে তীব্র সমর্থন জ্ঞাপন করেন। যুক্তিবাদী এই লেখক ফ্রান্সের স্বৈরচারী শাসনকে নানাদিক থেকে সমালোচনা করে তুলোধুনো করেন। বিশেষত বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্সের জনগণকে কেবলমাত্র লেখনী শক্তির মাধ্যমে বিদ্রোহী করে তুলতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিলো।

৩. **রুশো:** ফরাসি বিপ্লব নিয়ে যে সকল লেখক ও তাত্ত্বিক উদ্দীপনামূলক রচনাগুলো তৈরি করেছেন তাদের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বের সাথে রুশোর অবদানকে স্মরণ করতে হয়। তিনি বিপ্লবপূর্ণ ফ্রান্সে এক অভূতপূর্ব চেতনা ও প্রতিরোধের বাণীর সঞ্চারণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধের মন্ত্রণা দিয়ে তিনি ইউরোপীয়দের মাঝে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিবাদই ছিলো প্রথম প্রতিরোধ যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে। রুশোর লেখালেখি ফরাসি বিপ্লব-পূর্ব সময়ে মানুষকে প্রতিবাদের চেতনায় উদ্দীপ্ত করে। একজন লেখক কিংবা দার্শনিক হিসেবে ভলতেয়ার যেমন বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন রুশো চাইতেন সামাজিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনতন্ত্র পুনর্গঠিত হোক। রুশো মনে করতেন মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেও চারপাশের নানা দায়িত্বও নিয়মের মধ্যে পড়ে পরাধীন হয়ে পড়ে। তাই মানুষের জন্মগত দায়িত্ব সকল পরাধীনতার জিঞ্জির ছিড়ে মুক্ত স্বাধীন জন্মগত সত্তাকে সমুন্নত করা। প্রচলিত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি পুরোপুরি আস্থাহীন রুশো ছিলেন গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি সব জনগণের একনিষ্ঠ সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই প্রথম মতামত প্রদান করেন রাষ্ট্র যদি জনগণের কথা মতো পরিচালিত না হয় তবে সেই রাষ্ট্রের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জনগণের অধিকার এমনকি নৈতিক দায়িত্বও বটে। তিনি বিখ্যাত *সোসিয়েল কন্টাক্ট* (Sociale Contract) গ্রন্থে এই কথাই স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি আরো বলেন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটিই মানব সভ্যতার বিকৃতি ও অবনমনের জন্য দায়ী। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন যে সকল মানবাধিকার সম্পর্কিত বাণীর প্রথম পরিচয় মেলে সেগুলোর একটি পরিপূর্ণ রূপ দেখা যায় রুশোর রচনাগুলোতে।

৪. **অর্থনীতিবিদদের প্রভাব:** ফ্রান্সের অর্থনীতিতে ক্রমাগত ধ্বস আর মানুষের জীবনযাত্রার ক্রমাবনত অবস্থা থেকেই ফরাসি বিপ্লবের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিলো। তুর্গোর মতো একজন গুণী অর্থমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করার মধ্য দিয়েই বলতে গেলে ফরাসি রাজতন্ত্র একটি বিপ্লবের সম্মুখীন হওয়ার পথ করে নেয়। বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের নীতিতে বিশ্বাসী অর্থনীতিবিদগণ তখনকার ফ্রান্সে ফ্রিজিওক্র্যাট (Physiocrats) নামে পরিচিত ছিলেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্রত নিয়ে আন্দোলন পরিচালনাকারী এই গ্রুপের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন সে (Say), কুইজনে (Quesnay) ও মিরাবুঁ (Mirabeau)। তবে এঁদের মধ্যে সবথেকে চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন কুইজনে। তাঁর নেতৃত্বে ফিজিওক্র্যাটরা অর্থনীতির নতুন নতুন ব্যখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁদের দৃষ্টিতে মূল উৎপাদনকারী শ্রেণি হিসেবে কৃষক, শ্রমিক ও বিভিন্ন মজুর হচ্ছে সম্পদের প্রকৃত মালিক কিন্তু তারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত। পাশাপাশি কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁরা। তাঁরা সবসময় চাইতেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরভাগ ও বাইরে বাণিজ্য সুবিধা অবাধ ও অরারিত করা হোক। শিক্ষা মানুষের জীবনকে পরিশীলিত, মার্জিত ও উন্নত করে এই বিশ্বাস থেকে শিক্ষাকে শ্রেণি-ধর্ম নির্বিশেষে অবারিত করার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা।

৫. **বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়া রচনাকারী:** আলোকময়তা পরবর্তীকালের ইউরোপে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিলো। এই সময়ের ফ্রান্সে একদল চিন্তাশীল গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে যাঁরা বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে একত্রিত করে গ্রন্থিত করার মহান ব্রত গিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এঁদের মধ্যে দিদেরো, দ্য এলেম্বার্ট প্রমুখ ব্যক্তি অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের নেতৃত্বাধীন বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ লেখনীতে ফ্রান্সের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও চার্চের অনৈতিক নির্যাতনের কঠোর সমালোচনা করেন। পাশাপাশি সামাজিক অনাচার, দুর্বলের উপর অভিজাতদের চড়াও হওয়ার নীতি, বিচারব্যবস্থার কলুষিত দিক, অসম রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আর্চ বিশপের নেতৃত্বাধীন ধর্মাধিষ্ঠানভিত্তিক ষড়যন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করা হয়। শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এই গোষ্ঠী লেখনীর দ্বারা বিভিন্ন অনৈতিকতা ও অসমতা জনগণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যা বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালে এবং ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।

ফরাসি বিপ্লবের অন্যান্য কারণগুলো

সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি কিছু বিচ্ছিন্ন কারণ ছিলো যেগুলো ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পটভূমি রচনা করেছিলো। বিশেষত ফ্রান্সের অসমতা ও অসঙ্গতির সময়ে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের সফলতা, ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব, কিছুদিন আগে সংঘটিত হওয়ার দুর্ভিক্ষ ও মঙ্গা থেকে শুরু করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অসমতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এই বিষয়গুলো মানুষকে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে বাধ্য করে। মানুষ আমেরিকার বিপ্লবীদের দেখে প্রতিবাদ করতে আগ্রহী হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন লেখকের রচনা পড়ে তারা বাইরের দেশগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছিলো। বাইরের দেশগুলোতে কিভাবে বিপ্লবীরা সফল হয়েছে তা জানতে পেরে তারাও অনেক সাহস নিয়ে ফ্রান্সের স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিল।

১. **ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের প্রভাবঃ** দ্বিতীয় জেমসের অত্যাচারে অতীষ্ঠ ইংরেজরা হল্যান্ডের অরেঞ্জ পরিবারের রাজকুমারী মেরির স্বামী উইলিয়ামকে ইংল্যান্ডের সিংহাসন লাভের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রথমত ইংল্যান্ডের মানুষ ভেবেছিল দ্বিতীয় জেমসের পর রাণী হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন মেরি। কিন্তু জেমসের এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়াতে মানুষের মনে আশংকা জন্ম নেয়। তারা ভাবতে থাকে প্রোটেস্ট্যান্ট মেরির বদলে দ্বিতীয় জেমসের পুত্র ক্যাথলিক হবেন তাদের শাসনকর্তা। ফলে তিনিও পিতার মতোই অত্যাচারী হয়ে উঠতে সময় নেবেন না। ইংরেজদের আমন্ত্রণে অরেঞ্জ পরিবারের উইলিয়ামের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসনকর্তাকে রাজি করানো যায়নি। ইংরেজরা মেরিকে রাণী হিসেবে সিংহাসন প্রদান করে উইলিয়ামকে সহচর রাজা হিসেবে ক্ষমতায় বসাতে

রাজি হয়। উইলিয়াম স্ত্রীর সহচর রাজা হিসেবে ইংরেজ সিংহাসনকে অবহেলায় ফিরিয়ে দিলেন। পরে তাঁকে যুগ্ম রাজা ঘোষণা করায় তিনি ইংল্যান্ডের সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজি হন। ১৬৮৮ সালের নভেম্বর মাসে বিশাল বাহিনী নিয়ে ডেভনশায়ারের টোরে নামক স্থানে উপস্থিতি হন উইলিয়াম। বীরবিক্রমে উইলিয়ামের মতো একজন কুশলী যোদ্ধা ও জনপ্রিয় সেনানায়কের আগমনে দ্বিতীয় জেমসের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তিনি উইলিয়ামকে বাধা দেয়ার সাহস হারিয়ে ফ্রান্সে পলায়ন করেন। এই সময় দ্বিতীয় জেমসের পদচ্যুতি 'রক্তপাতহীন বিপ্লব' বা 'গৌরবময় বিপ্লব' নামে পরিচিত। উইলিয়ামের সিংহাসন লাভের সাথে সাথে রাজার সর্বময় ক্ষমতার দর্শন ইংল্যান্ডের ইতিহাস থেকে আপাতত বিদায় নেয়। উইলিয়ামের সময় থেকে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট চাইলে যেকোনো ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করার অধিকার লাভ করে। ইংল্যান্ডের এই বিপ্লব ফরাসি বিদ্রোহীদের প্রভাবিত করে।

২. **আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধঃ** আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ফরাসি বিপ্লবকে নানা দিক থেকে প্রণোদনা যোগায়। বিশেষ করে আমেরিকায় ফ্রান্সের অনেকগুলো উপনিবেশ ছিলো। অন্যদিকে লাফায়েত (Lafayette) নামে একজন বিপ্লবী আমেরিকায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। উপনিবেশের যুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তাকারী ফরাসি সৈন্যবাহিনী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সফল হয়ে দেশে ফিরে আসে। তাদের অনেকেই বেকার হয়ে গিয়েছিল। দেশে ফিরে তারা স্বৈরাচারী শাসকদের নানামুখী শোষন নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত হয়। যুদ্ধে পারদর্শী এই সকল বরখাস্ত সৈনিকদের উপর যখন অভিজাতশ্রেণি সাধারণ কৃষকদের মতো অত্যাচার চালাতে শুরু করে তখন তারা চুপ করে থাকেনি। লাঙল কোদাল দিয়ে নরম মাটি চাষ করা নিরীহ কৃষকদের মতো এদের হৃদয় সহনশীল ছিলো না। বলতে গেলে রাজতন্ত্রের প্রয়োজনে যুদ্ধকারী এসব সৈনিক অস্ত্র জমা দিলেও তাদের ট্রেনিং জমা দিতে হয়নি। ফলে শত্রুপক্ষের রক্তঝরিয়ে যুদ্ধজয়ী এসব সৈনিক সময় সুযোগ বুঝে নিজ দেশে প্রশাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেয়। এই দিক থেকে বলতে গেলে ফরাসি বিপ্লবের একটি সফল পরিণতির বীজ প্রোথিত রয়েছে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে।

৩. **দুর্ভিক্ষঃ**সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনিতে ফ্রান্সের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিলো যেসব শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন একটি সময় সীমা ছাড়ায়। রাষ্ট্রের অসহনীয় কর, অভিজাতদের শোষণ নিপীড়নের সাথে যুক্ত হয় গির্জার বিশপদের ধর্মনির্ভর ষড়যন্ত্র। একটি সময় এসব সাধারণ মানুষের দিন পার হতে থাকে জীবন্মৃত অবস্থায়, পুরো দেশজুড়ে দেখা যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে ফরাসিদের জীবনে দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিলো না। এই সময় মানুষ স্পষ্ট দেখতে পায় ফরাসি রাজতন্ত্র ও গির্জার ধর্মীয় ষড়যন্ত্রের সকল নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করলে তাদের না খেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। অন্যনিকে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যদি মৃত্যুও আসে তা হবে অনেক শান্তির। পাশাপাশি আমেরিকার বিপ্লবীদের সাফল্য তাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জয়ের স্বপ্ন দেখায়। এদিক থেকে বলতে গেলে ১৭৮৮-৮৯ খ্রি. সংঘটিত এই দুর্ভিক্ষ ফ্রান্সের মানুষকে শুধু যন্ত্রণাই দেয়নি পাশাপাশি বিদ্রোহী হয়ে উঠতে বাধ্য করেছে।

৪. **ধর্মীয় প্রভাবঃ**ক্যাথলিক মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি প্রতিবাদী ধর্মগুলোর প্রতি ভয়াবহ দমননীতি ছিলো ইউরোপের যেকোনো দেশের মতো ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে চার্চের মাধ্যমে ক্যাথলিক ধর্মীয় নীতি নির্ধারক ও বিশপরা রাজতন্ত্রকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে রাজারাও নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মকে কাজে লাগাতে পেরে ধন্য হয়ে চার্চ ও বিশপদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন। মার্টিন লুথার, জন কেলভিন থেকে শুরু করে এমনি কিছু ধর্ম সংস্কারকের ভূমিকায় ক্যাথলিকবাদের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে। চার্চ ও পোপের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সম্রাট থেকে শুরু করে গির্জা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মারাত্মকভাবে চড়াও হয় প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে দীক্ষিত মানুষের উপর। ইনকুইজিশনের মতো বর্বর বিধান চাপিয়ে মানুষকে নির্যাতন এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। এই অবস্থায় ধর্মের অধিকার আদায়ে স্বোচ্চার প্রতিবাদী মানুষ ফরাসি বিপ্লবের হাতিয়ারে পরিণত হতে সময় নেয়নি।

৫. **রাজবংশের ভূমিকাঃ** ফরাসি বিপ্লবের জন্য সেখানে শাসনরত বুরবোঁ রাজবংশকে সবার আগে দায়ী করতে হয়। ফ্রান্সের রাজাগন নিজেদের ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে মনে করতেন। চতুর্দশ লুইয়ের সময় ক্ষমতার

অবস্থান এমন স্তরে উপনীত হয় যেখানে তিনি সরাসরি ঘোষণা দিয়ে বসেন 'আমিই রাষ্ট্র'। আর এই ঘোষণা থেকে ফরাসি রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছিলো। এই সময় থেকেই ফরাসিদের পতন শুরু হয় কিন্তু তা বুঝতে অনেক সময় পায় হয়ে যায়। ফ্রান্স একাধারে নিজ দেশ ও পৃথিবীর নানা স্থানে স্থাপিত উপনিবেশগুলো থেকে বিদ্রোহে টালমাটাল অন্যদিকে শুরু হয়ে যায় রাজাকে অপসারণের আয়োজন। চতুর্দশ লুইয়ের সময় ফ্রান্সের রাজ্যসীমা সবথেকে বেশি বিস্তৃতি লাভ করলেও তখন থেকেই ফরাসিদের পতন শুরু হয়। বিশালায়তনে বর্ধিত এই রাষ্ট্রের জন্য যেমন সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিলো বুরবোঁ রাজাগণ সেক্ষেত্রে পুরোপুরিই ব্যর্থ হয়েছিলেন।

পাঠ-২.৩ ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ শ্রেণি সংঘাত, শ্রমিক অসন্তোষ থেকে শুরু করে নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এই অবস্থায় কেবলমাত্র ফ্রান্সেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। অন্য কোথাও না হয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার উপযুক্ত কারণ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে। ফিশার মনে করেন 'ফ্রান্সে উপরের শ্রেণির মানুষের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধার বিপরীতে নিম্ন শ্রেণির সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার ফলে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল'। ফ্রান্সের রাজশক্তি যদি সামন্ত প্রথার নিপীড়নমূলক নীতিগুলোর সংস্কার সাধন করে এর ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হত, তবে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা কমে যেত। কিন্তু ফ্রান্সের রাজশক্তি সামন্তবাদ নিয়ন্ত্রণে তো আনেইনি, উপরন্তু তারাও সামন্ত প্রভুদের সাথে মিলেমিশে দেশের সাধারণ জনগণ, কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল। জীবন বাঁচানোর দায়টা যেখানে বড়, সেখানে আর কোনো সহজ বিষয় কাজ করবে না। এই রকম একটি পরিস্থিতিতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ফরাসি জনগণ বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণি বিদ্রোহ ঘটায়। দুর্নিবার প্রতিরোধ গড়ে তুলে পতন ঘটায় দুর্ভাবনার বাস্তিল দুর্গের।

তবে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মোর্স স্টিফেন্স মনে করেন ইউরোপের অন্য দেশে না ঘটলেও ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে যাওয়ার অন্যরকম কারণ ছিল। তিনি মনে করেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিংবা দার্শনিক কারণে ফরাসি বিপ্লব ঘটেনি। তাঁরা দৃষ্টিতে ফ্রান্সে তেজদীপ্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচিত হয়েছিল প্রচুর, সেগুলো মানুষকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে। এর থেকেই অনেকটা আশাবাদী হয়ে ওঠে নিপীড়িত মানুষ বিদ্রোহ করে। ঐতিহাসিক হার্নস মনে করেন বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজের অসন্তোষের কথা জানতো। পক্ষান্তরে এই সব সাহিত্য পাঠ ও চর্চা করে তারা বুঝতে পারে খুব সহজেই ফরাসি রাজতন্ত্রের সমাধি রচনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে শ্রমিক ও জনতার অসন্তোষকে উস্কে দিতে পারলেই ক্ষমতার বদল ঘটবে। আর সে সময় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে জ্ঞানী বুর্জোয়ার পক্ষে অনেক সুযোগ আসবে। বিশেষ করে একটি সরকারের পতনের পর নতুন সরকার গঠনকালীন সময়ে বুর্জোয়াদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। ঐতিহাসিক মদেলা মনে করেন , ফ্রান্সের রাজশক্তি সময়মত তার অভিজাতদের দমন করতে সক্ষম না হওয়ার পাশাপাশি তাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বিপ্লব আসন্ন হয়ে পড়েছিল। ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটার বিশেষ কিছু কারণ ছিল। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হল–

১. অর্থনৈতিক সংস্কারজনিত কারণে ফ্রান্স ক্রমশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়েছিল। চরম অর্থনৈতিকস দুরাবস্থার মধ্যে মানুষের মনে ভর করে তীব্র হতাশা। এই সময় খুব সহজেই বলে দেয়া যায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতায় একটি বদল সময়ের দাবি। এখানে একটি বিপ্লব আসন্ন সে বিপ্লবে কারা জিততে যাচ্ছে তার থেকে বড় বিষয় হয়ে পড়ে জনমত। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে জনগণের রায় চলমান রাষ্ট্রক্ষমতার বিরুদ্ধেই শুধু যায়নি তারা লিপ্ত হয়েছে এক দুর্ধর্ষ সংগ্রামে। এই সংগ্রাম ইউরোপের আর কোথাও না ঘটায় বিপ্লব ফ্রান্সেই সংঘটিত হয়।

২. বিপ্লবীদের সব থেকে বড় সাফল্য এ-যাবৎ অবহেলিত প্রান্তিক ও নিপীড়িত গোষ্ঠীর সমর্থন আদায় করা। বিশেষ করে শ্রমিকদের মনে বদ্ধমূল ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সীমাহীন দু:শাসন চালিযে ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতা যেটাই তুলে ধরুক না কেনো এই শক্তিশালী রাজতন্ত্র আর তার দানবীয় অভিব্যক্তি তাদের প্রান্তিক করে দিয়েছে। মানুষের মনে বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে– এবারের প্রতিরোধ সংগ্রাম শুধু একটি আন্দোলনই নয়, এবার তাদের সামনে রাজতন্ত্রের অত্যাচার, লুণ্ঠন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ এসেছে। তারা মনে করেছেন, বিপ্লবীরা বিজয়ী হলে প্রতিটি শ্রেণির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। র বিপ্লবীদের পক্ষে কাজ করে কয়েকজন দার্শনিক তার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তিও মজবুত করে দিতে পেরেছিলেন। ফলে নৈতিক, জ্ঞানগত ও অবস্থানগত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপ্লব ঘটানোর একটি প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়ে যায় ফ্রান্সে যা ইউরোপের আর কোথাও হয়নি।

৩. ফরাসি বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী চেয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর নিম্ন শ্রেণী তাদের যন্ত্রণায় ভরা ক্ষুধা-দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি। পক্ষান্তরে ধনী শ্রেণী তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশে চেয়েছে। কিন্তু রাজা ও তাদের আজ্ঞাবহ নাইট এবং সামন্ত প্রভুদের নিষ্পেষণে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল বেশ কঠিন। ফলে ফ্রান্সের বিপ্লবপূর্ব পরিস্থিতিতে শ্রেণি সংঘাত উৎরে গিয়ে একটি প্রতিরোধের মত প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের শাসনে রাজাদের কীর্তিকলাপ জনগণের সামনে উপস্থিত থাকায় প্যারিস থেকে লিঁও প্রায় সবখানেই এক ধরনের রাজতন্ত্রবিরোধী মনোভাব বিরাজ করছিল। তারা ক্ষমতায় কে আসবে তার থেকে বেশি আগ্রহী হয়েছিলেন

রাজতান্ত্রিক দস্যুবৃত্তির হাত থেকে মুক্তি ও একটি পরিবর্তনের জন্য। এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের যৌক্তিত অবস্থান ও জনসংযোগের স্বার্থকতার পাশাপাশি জনমত তাদের পক্ষে কাজ করায় বিপ্লব ঘটানো অনেক সহজ হয়ে যায় তাদের পক্ষে। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে ইউরোপের অন্য যেকোন স্থানের থেকে ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটার সুযোগ ছিল সব থেকে বেশি।

৪. রাজতান্ত্রিক শাসনামলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ছন্দপতন ঘটেছে তার তাদের দুরদর্শিতার অভাবের কারণেই হয়েছিল। ফলে ফরাসি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনরোষ এবং বিপ্লবীরা সংশ্লিষ্ট যে মিথগুলোর জন্ম দিয়েছিল, সেগুলোকেও বাস্তব প্রমাণ করে দেয়। তাদের বিশ্লেষণে ছিল প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সঞ্চয়, সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বেসরকারি বিনিয়োগ থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মতো বিষয়। এ ধরনের কয়েকটি প্রকল্প সরাসরি মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় জনগণ রাজতন্ত্রের প্রতি বিষিয়ে ওঠেন এবং বিপ্লবীদের পক্ষে প্রবল শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়ে যায়।

৫. ফরাসি রাজাদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ সাধারণ মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে যায়। এর বিপরীতে বিপ্লবীদের জনগণের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার আশ্বাস প্রদান এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় দাবি সকলের কাছে অনেক বেশি জোরালো ও যুগোপযোগী হওয়ায় তার গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যায়। অন্যদিকে উপযুক্ত প্রচারণায় বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে তাদের উদ্যোগের সংবাদ নিয়ে পৌঁছে যাওয়াটাও ছিল অনেক বড় একটি বিষয়। বিপ্লবীরা অনেক দিন আগে থেকেই অবহেলিত মানুষকে সাথে নিয়ে সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের লিঁও কিংবা প্যারিস থেকে প্রচারিত রাজতন্ত্রের স্তুতিকে মানুষ নিছক রাজতন্ত্রের পক্ষে দালালি এবং অন্তঃসারশূন্য প্রচারণা হিসেবে বিবেচনা করেছে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে বিপ্লবীদেরই জয় হয়েছে। শক্তিশালী ফরাসি রাজতন্ত্র জনতার প্রতিরোধে স্রোতের মুখে পড়া দুর্বল বালির বাঁধের মত ধ্বসে গেছে।

৬. সীমাহীন ক্ষমতা নিয়ে দেশ শাসনে বুরবোঁ রাজাদের নানা অপকর্ম ফরাসিদের বিক্ষোভে ফেটে পড়তে বাধ্য করে। ১৮ শতকের ইউরোপে অন্য দেশের রাজতন্ত্র যেখানে আস্তে আস্তে মানুষের জন্য কল্যাণকামী হয়ে উঠছে ঠিক তখন বুরবোঁদের স্বেচ্ছাচারীতা সীমা ছাড়িয়েছিলো। এর ফলে ফ্রান্সের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ফলে সেখানেই বিপ্লব ঘটেছিল।

৭. ফ্রান্সে বিদ্যমান ৪০ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে নানামুখী প্রভাব খাটালেও মূল ক্ষমতা ছিল স্থানীয় সরকারের প্রশাসকদের হাতে। এই সমস্ত স্থানীয় সরকারের প্রধান ইনটেনডেন্ট ও তার কর্মচারীরা জনগণের উপর নানামুখী অত্যাচার চালাতো। অন্যদিকে প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তগ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতা, অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপের আধিক্য থেকে শুরু করে নানা অনাচার দেখা দেয়। এই অনাচারে অতিষ্ঠ ফ্রান্সের মানুষ বিপ্লব ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল।

৮. ১৮ শতকে এসেও মধ্যযুগীয় বর্বর সামন্তপ্রথা ফ্রান্স থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়নি। সামন্তপ্রভুদের নারকীয় অত্যাচার নির্যাতন আর অনৈতিক কর্মকাণ্ড মানুষকে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এক মানবেতর অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। সময়ের দাবি মেটাতে তাদের সামনে বিপ্লবী হয়ে ওঠা বাদে দাবি আদায়ের আর কোনো বিকল্প পথ ছিলো না। তাই ইউরোপের অন্যদেশে না ঘটে বিপ্লব ফ্রান্সেই ঘটেছিল।

৯. ফ্রান্স এমন একটি দেশে পরিণত হয়েছিল যেখানে ক্ষমতার বিভিন্নতায় একই আইন প্রায়োগিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক লাভ করেছিলো। আইন প্রয়োগের এই অসম অবস্থান প্রশাসনযন্ত্রকে নিয়মতান্ত্রিক ষণ্ডাতন্ত্রের রূপ দিয়েছিলো। বিশেষ করে রোমান আইনে পরিচালিত দক্ষিণ ফ্রান্সের সাথে উত্তর ও মধ্য ফ্রান্সের আইনের পার্থক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা স্থান বদল করতো। এভাবে দোষী ব্যক্তিরা খুব সহজেই উপযুক্ত শাস্তি থেকে বেঁচে যেতো। অন্যদিকে প্রচলিত কঠোর আইনে মামুলি অপরাধেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করার পর্যন্ত বিধান রাখা হয়েছিলো। এভাবে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষ একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন চেয়েছিল।

১০. ১৮৫৫ সালে সাক্ষরিত গুরুত্বপূর্ণ অগসবার্গের সন্ধির পর রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম এমন নীতি প্রতিষ্ঠা পায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রজাদের বাধ্যতামূলক ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে দীক্ষিত করা হয়। ধর্ম বিশ্বাস যার যার আর দেশটা সবার এমন ধারণা তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। মানুষ তার চিন্তাজাগতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলো। বারংবার সংস্কার, পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্য দিয়ে খ্রিস্টধর্ম ততোদিনে একটি নতুন রূপ লাভ করেছে। কিংবা ক্যাথলিকদের অত্যাচারের অতিষ্ট অনেক প্রজা চাইছে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদে দীক্ষিত

হবে। এক্ষেত্রে উভয় চিন্তার মানুষের উপরেই নেমে আসে বিভীষিকাময় নির্যাতনের ঘটনাগুলো। তখন দেখা গেছে তাদের সামনে বিদ্রোহ ছাড়া অন্যকোন পথ খোলা নেই।

১১. অর্থনৈতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে একটি কারণ ছিল ফ্রান্সের কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার খাতটি। অযৌক্তিক, বিভ্রান্তিকর ও ত্রুটিপূর্ণ এই ব্যবস্থায় অভিজাত শ্রেণি বলতে গেলে ফ্রান্সের বেশিরভাগ ভূমি তাদের দখলে রেখেও করের আওতার বাইরে থেকে যায়। তারা করের বাইরে থাকায় রাষ্ট্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। এই ত্রুটিপূর্ণ কর পদ্ধতির কারণে রাজকর্মচারী ও জমিদার এমনকি চার্চের রক্ষীদের হাতে পর্যন্ত নির্যাতিত হতো অসহায় কৃষক। আর এই নির্যাতিত জনগোষ্ঠীই পরবর্তীকালে ফরাসি বিপ্লবের মূল হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছিলো যা স্পষ্টতই বোঝা যায়।

১২. চতুর্দশ লুই অযৌক্তিকভাবে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এই যুদ্ধগুলোর ফলে ফরাসি রাজকোষ প্রায় শূন্যের কোটায় গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি তাঁর পরবর্তী রাজা পঞ্চদশ লুইকে অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোযোগী হতে নির্দেশ দিলেও তিনি তার কথার পরোয়া করেননি। পঞ্চদশ লুই অনিয়ন্ত্রিত বিলাস-ব্যাসনের পাশাপাশি আরো কয়েকটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ফরাসি রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়।

১৩. ডেভিড থমসন দেখিয়েছেন প্রায় ৬৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেও সেই অনুপাতে মানুষের আয় একদম বাড়েনি যা ফরাসি বিপ্লবের আগমণ ত্বরান্বিত করে। ফ্রান্সের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য রুটির মূল্য শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়াতে সাধারণ শ্রমিক ও চাকুরীজীবীদের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্ধাহার, অনাহার ও আর রুটিদাঙ্গা হয়ে ওঠে তখনকার ফ্রান্সের নিত্য নৈমিত্যিক ব্যাপার। ফলে মানুষের সামনে প্রবল বিদ্রোহের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের পতন ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

১৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ১৭৮৮ সালের ফ্রান্সে ভয়াবহ খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে। জীবন বাঁচানোর জন্য হাজার-হাজার বুভুক্ষু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ি দেয় এবং প্যারিসে এসে সমবেত হতে থাকে। ক্ষুধার্ত মানুষ শহরে এসে বাকিদের বিলাস ব্যসনের জীবন দেখে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা এখানে এসে একইসাথে দেখতে পায় নিজেদের দৈন্য আর তাদেরই হাতে উৎপাদিত ফসলে শহুরেদের অযৌক্তিক বিলাসিতা। তখন বেশিরভাগ ফরাসি গ্রামবাসী প্রতিবাধ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজকর্মচারীরা তাদের দমন করার চেষ্টা করলে সাধারণ বিদ্রোহ রূপ নেয় রাজতন্ত্রবিরোধী এক স্বশস্ত্র সংগ্রামে।

পাঠ-২.৪ ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ

রাজতন্ত্রের অত্যাচারের মুখে প্রতিবাদী জনগণ যখন ফুঁসে ওঠে ঠিক তখনি তাদের সাথে যোগ দেয় বুর্জোয়া শ্রেণি বা নতুন ধনিক শ্রেণি। আরেকটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি রচনা করে দেয় অধিকারবঞ্চিত বুর্জোয়া শ্রেণি। তাদের সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অনেক বেগবান হয় আন্দোলন। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রচার ও প্রণোদনায় একসময় সাধারণ জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণে বিদ্রোহ সর্বাত্মক রূপ নিয়ে সূচনা হয় ফরাসি বিপ্লবের। বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করলে ফরাসি বিপ্লবকে তিনটি ধাপে আলোচনা করা যেতে পারে। কালপরিসর বিবেচনায় প্রথমত উন্মেষ পর্ব, সক্রিয়করণ পর্ব, পরিণতি পর্ব এই তিনটি ধাপে ফরাসি বিপ্লবকে আলোচনা করা যেতে পারে। নিচে একটি সারণিতে সময়কাল অনুযায়ী ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাগুলো তুলে ধরা হল–

সময়কাল অনুযায়ী ফরাসি বিপ্লব

প্রথম ধাপ: সমগ্র ফ্রান্সজুড়ে কৃষিকাজে মন্দাভাব। খাদ্য ও এবং আবাসন সংকটের কারণে কৃষকরা দুর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়ে। জীবন বাঁচানোর তাগিদেই তারা বিভিন্ন স্থানে ফরাসি রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।	
জুন-জুলাই ১৭৮৮:	গ্রেনোবেল এর বিদ্রোহ
৮ আগস্ট ১৭৮৮:	বিভিন্ন জনের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে জানতে জাক ন্যাকারের কথামত রাজা স্ট্রেটস-জেনারেল এর সভা অহবান করেন।
৫ মে ১৭৮৯:	ভার্সিলিস এ স্ট্রেটস জেনারেলের সভা শুরু।
১৭ জুন ১৭৮৯:	নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবিতে আন্দোলন শুরু।
২৩ জুন ১৭৮৯:	রাজা টায়ারের রেজুলেশন বাতিল ঘোষণা করেন।
৯ জুলাই ১৭৮৯:	ফরাসি সংসদ থেকে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়।
১২ জুলাই ১৭৮৯:	ন্যাকারের পদচ্যুতি, সেই সাথে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ মিলে অস্ত্রধারণ করে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে।
১৪ জুলাই ১৭৮৯:	সশস্ত্র জনতা তীব্র-আক্রমণ করে বাস্তিল দুর্গের দখল নিয়ে নেয়।
১৫ জুলাই ১৭৮৯:	ন্যাশনাল গার্ডের সর্বাধিনায়ক হিসেবে লাফায়েত এর নিয়োগ।
১৭ জুলাই ১৭৮৯:	ফ্রান্স জুড়ে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হলে সর্বত্র তীব্র ভীতির সঞ্চার হয়।
৫-১১ আগস্ট১৭৮৯:	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ডেকে ফ্রান্সের সামন্তপ্রথা বাতিল করা হয়।
২৬ আগস্ট১৭৮৯:	মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি থেকে বিশেষ আইন পাশ করা হয়।
৫ অক্টোবর ১৭৮৯:	নারীদের একটি প্রতিনিধি দল রাজার সাথে সাক্ষাত করে তাদের উপযুক্ত অন্ন সংস্থানের পাশাপাশি ন্যায্য অধিকার দাবি করে।
৬ অক্টোবর ১৭৮৯:	রাজার প্যারিস প্রত্যাবর্তন।
২ নভেম্বর ১৭৮৯:	চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ নিয়ে গণপরিষদে বিশেষ আইন পাস হয়।
১৬ ডিসেম্বর ১৭৮৯:	ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
২৮ জানুয়ারি ১৭৯০:	ইহুদিদের বিরুদ্ধে আনীত সামাজিক অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার।
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৭৯০:	ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানাবিধ বাড়াবাড়ির শুরু।
১৯ জুন ১৭৯০:	অভিজাত শ্রেণির পদমর্যাদায় বিলোপ সাধন।
১৪ জুলাই ১৭৯০:	ষোড়শ লুইয়ের ভূমিকায় রাজা ও চার্চের অবস্থানগত সাম্যাবস্থা অর্জন।
১৮ আগস্ট১৭৯০:	বিপ্লব প্রতিরোধে বিশেষ অ্যাসেম্বলি সভা আহবান।
৩০ জানুয়ারি ১৭৯১:	ফরাসি অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে মিরাবুঁর নির্বাচন।
২ মার্চ ১৭৯১:	রাজকীয় গিল্ড ও নিয়ন্ত্রণাধীন একচেটিয়া বাজারের দাপট হ্রাস।

১৫ মে ১৭৯১:	ফরাসি উপনিবেশগুলোতে কালো মানুষের সম-অধিকার অর্জন।
২১ জুন ১৭৯১:	উপয়ান্তর না দেখে প্যারিসে থাকতে বাধ্য হন রাজা ষোড়শ লুই।
১৫ জুলাই ১৭৯১:	অ্যাসেম্বলির বিশেষ ঘোষণায় রাজাকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে।
১৭ জুলাই ১৭৯১:	রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের উপর সরকারি বাহিনীর গুলিবর্ষণ।
১৩ সেপ্টেম্বর ১৭৯১:	রাজার সংবিধানকে বৈধতা দান।
৩০ সেপ্টেম্বর ১৭৯১:	গণপরিষদের সভা অনুষ্ঠিত।
১ অক্টোবর ১৭৯১:	বিশেষ সরকারি আদেশ জারি।
৯ নভেম্বর ১৭৯১:	বিয়ের পাশাপাশি বিচ্ছেদ বিষয়ে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয় সেখানে সাংসারিক জীবনের উপরেও রাজ্য ও রাজার হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখা হয়।
১১ নভেম্বর ১৭৯১:	অ্যাসেম্বলির কাজে রাজার ভেটো দান।
জানুয়ারি মার্চ ১৭৯১:	প্যারিসের আশেপাশে খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা শুরু।
৯ সেপ্টেম্বর ১৭৯১:	এমিগ্রের সম্পত্তির চারপাশে প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ।
২০ এপ্রিল ১৭৯২:	ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও ফরাসি বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে থাকে।
২০ জুন ১৭৯২:	অ্যাসেম্বলিতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি জ্যাকোবিনরা রাজার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে।
২৫ জুলাই ১৭৯২:	ডিউক ব্রাঞ্চউউক ফ্রান্সের আক্রমণ সামনে রেখে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করেন।
১০ আগস্ট ১৭৯২:	শক্তি বৃদ্ধির এক পর্যায়ে জ্যাকোবিনরা অস্ত্রধারণ করে অনেক সুইস গার্ডকে হত্যা করে এবং রাজাকে বন্দি করে।
১৯ আগস্ট ১৭৯২:	লাফায়েত অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যান।
২২ আগস্ট ১৭৯২:	ভেন্দেই ও ব্রিটানিতে অভিজাতদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়। পাশাপাশি ল্যাংওয়ে ও ভের্দুন আক্রান্ত হলে সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
দ্বিতীয় ধাপ: বুর্জোয়া এবং অভিজাতদের ক্রমাগত দ্বন্বের সেই রীতি অনেকটা পাল্টে যায়। এই সময় বুর্জোয়াদের সাথে অধিকার আদায় নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে প্রলেটারিয়েটদের। ধীরে ধীরে এই সংঘাত ফ্রান্স থেকে ছড়িয়ে পড়ে পুরো ইউরোপের নানা স্থান জুড়ে।	
১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	জনগণের সরকারবিরোধী বিক্ষোভ।
২ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	প্যারিসের কারাগারে আটক প্রায় ১২০০ অভিজাতকে এই সময় হত্যা করা হয়।
২০ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	সেনাবাহিনীতে দ্বন্দ্ব শুরু হলে বিপ্লবীদের পক্ষে বিক্ষোভ জমিয়ে তোলা অনেক সহজ হয়ে যায়।
২১ সেপ্টেম্বর ১৭৯২:	দেশের আইন সংহিতা পরিবর্তন করে রাজার মত রাজনীতিতে পোপের হস্তক্ষেপের সুযোগও পুরোপুরি রোহিত করা হয়।
১৯ নভেম্বর ১৭৯২:	এডিক্ট অপ ফ্রেটার্নিটির অধীনে দুস্থদের সাহায্য প্রদানের আশ্বাস।
১১ ডিসেম্বর ১৭৯২:	রাজার বিচার শুরু।
২১ জানুয়ারি ১৭৯৩:	ষোড়শ লুইয়ের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৩:	ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণা।
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৩:	প্যারিসের রাস্তায় খাদ্য নিয়ে দাঙ্গা শুরু।
৬ এপ্রিল ১৭৯৩:	জননিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ কমিটি পত্তন।
২৪ এপ্রিল ১৭৯৩:	সেপ্টেম্বরের গণহত্যার জন্য মারাতের বিচার শুরু।

৪ মে ১৭৯৩:	রুটির দাম সর্বোচ্চ অবস্থানে উন্নীত।
২৭ মে ১৭৯৩:	প্যারি কমিউনের বিরুদ্ধে জনরোষ তুঙ্গে ওঠে।
২ জুন ১৭৯৩:	প্যারি কমিউন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
২৪ জুন ১৭৯৩:	পার্লামেন্টের সম্মেলনে জ্যাকবিনদের সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
১৩ জুলাই ১৭৯৩:	ক্যারোলেট কর্ডে জনগণের বন্ধু মারাতকে হত্যা করে।
১৭ জুলাই ১৭৯৩:	জনরোষ থামাতে ক্যারোলেটের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
১ আগস্ট১৭৯৩:	মাপজোকের ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি গৃহীত হয়।
২৩ আগস্ট১৭৯৩:	বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংকট চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।
৪-৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩:	প্যারিসের রাস্তায় দাঙ্গা শুরু।
১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯৩:	সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার নিপীড়ন শুরু হলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।
১৪ অক্টোবর ১৭৯৩:	বিচারের মধ্য দিয়ে মেরি এন্টয়নিয়েট এর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
২৩ অক্টোবর ১৭৯৩:	রিপাবলিকান ক্যালেন্ডার গৃহীত।
২৪ অক্টোবর ১৭৯৩:	২২ জন গিরনডিস্টকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর।
১০ নভেম্বর ১৭৯৩:	দু:শাসনে পুরো ফ্রান্সে অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছিল।
২৪ মার্চ ১৭৯৪:	ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের হোতা রোবেসপিয়ের অনেক বেশি শক্তিমত্তার অধিকারী হয়ে অনেকটাই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন করে।
১৮ মে ১৭৯৪:	ধর্মীয় রীতি নীতিতেও রোবেসপিয়ারের অনৈতিক হস্তক্ষেপ।
৮ জুন ১৭৯৪:	শাসকের সর্বময় ক্ষমতাধর হিসেবে অভিষেক।
১০ জুন ১৭৯৪:	প্রায় ২৭৫০ জন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিকে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে গিলোটিনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। অনেক অভিজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিও অরাজকতার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গিয়ে গিলোটিনের শিকার হন।
২৭ জুলাই ১৭৯৪:	ক্রমশ স্বৈরশাসক হয়ে ওঠা রোবেসপিয়ারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। পালানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ রোবেসপিয়ারকে তার অপরাধের শাস্তি হিসেবে প্রায় ১৫০ জন সঙ্গীসহ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।
তৃতীয় ধাপ: রুটির দামের নির্ধারিত মূল্য উঠিয়ে নেয়ায় বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন দলের হাতে বিপ্লবীরা প্রচণ্ড মার খায়। বিভিন্ন স্থানে আক্রমণের শিকার বিপ্লবীরা এই সময় দিশেহারা হয়ে পড়ে।	
১২ নভেম্বর ১৭৯৪:	গণপরিষদের বিশেষ আইন জারির মধ্য দিয়ে বিপদের মুখে পড়ে জ্যাকোবিনরা।
১ জানুয়ারি ১৭৯৫:	খ্রিস্টানদের ধর্মীয় আরাধনার জন্য চার্চ নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে।
মে - জুন ১৭৯৫:	দক্ষিণে শুরু হয় শ্বেত সন্ত্রাস।
৮ জুন ১৭৯৫:	জেলহাজতে ডাফিনের মৃত্যু হয়। কোঁৎ দ্য প্রোভেন্সি অষ্টাদশ লুই এর খেতাব লাভ করে।
২২ আগস্ট১৭৯৫:	তিন বছরের বিশেষ সংবিধান চালু করে ডাইরেক্টরির পত্তন।
৫ অক্টোবর ১৭৯৫:	সরকার পরিবর্তন নিয়ে অভিজাতরা নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে যার সুযোগ গ্রহণ করেন নেপোলিয়ন।.
২৬ অক্টোবর ১৭৯৫:	সংবিধান স্থগিত করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন জারি করা হয়।
২ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৬:	ইতালিতে ফরাসি বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নেপোলিয়নের সাফল্যলাভ।
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৬:	ডিরেক্টরগণ প্যানথিয়নের জনসভা নিষিদ্ধ করে দেয়।
১০ মে ১৭৯৬:	অনেক রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
৭ সেপ্টেম্বর ১৭৯৬:	বাবিউফের প্রায় শতাধিক সমর্থক ডিরেক্টরদের প্রাসাদ আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ

	হয়।
২৭মে ১৭৯৭:	দোষী সাব্যস্ত হয়েও অনেক বাবিউফ সমর্থক প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়।
মে ১৭৯৭:	১৭৯৮-৯৯ সালের নির্বাচন ডিরেক্টরদের আরো অসহনীয় করে তোলে।
১৮ জুন ১৭৯৯:	ডাইরেক্টরির পতন।
৯ নভেম্বর ১৭৯৯:	কনসাল জেনারেলের সভা আহবান করে ফ্রান্সের ক্ষমতা নিয়ে নেন নেপোলিয়ন।
২ ডিসেম্বর ১৮০৪:	নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন।

সারাংশ

সামন্ত্রতান্তিক ফ্রান্সের নতুন ধনিক শ্রেণি বা বুর্জোয়াদের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ছিল। ফলে তারা পেছন থেকে ফরাসি বিপ্লবের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসে। এই সময় অর্থনৈতিক দৈন্য থেকে শুরু করে নানা কারণে জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল ফ্রান্সের দরিদ্র শ্রেণি। এই ধরনের একটি প্রেক্ষাপট বিপ্লব অনিবার্য করে তোলে যারা শুরুটা হয় সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। দরিদ্রশ্রেণির এই সংগ্রাম ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে 'সাঁকুলেৎ' বা দরিদ্র শ্রেণির সর্বাত্মক সংগ্রাম নামে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধু ফ্রান্সের রাষ্ট্রক্ষমতায় পরিবর্তন এসেছে এমনটি নয়। বরং পুরো ইউরোপের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এসেছে অন্যরকম এক জোয়ার, বদলে গিয়েছিল রাজনীতির গতি প্রকৃতি।